ইসলামি রাষ্ট্রচিন্তার পুনর্গঠন

সূচিপত্র

সভ্যতার বুনিয়াদি চরিত্র ১৭
ধার্মিকতা ও পরোপকার ২৬
মানবসভ্যতার ঐক্য ৩৩
সভ্যতার উত্থান-পতনের রহস্য ৩৮
দ্বীন প্রতিষ্ঠার সামসময়িক গুরুত্ব ৪৬
জিহাদ ও ইনকিলাব ৫৩
কুরআনের মুজেজা ৫৭
কুরআনের প্রভাব ৬৪
হিকমতে আমালি ৬৮
তাসাওউফ ৭১
সভ্যতা ৭৫
ইসলামি ইতিহাসের সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ ও কুরআনের বৈশ্বিক বিপ্লব ৯২
ইসলামি ইতিহাসে জাতীয়তাবাদী প্রশাসনের যুগ ১১১
অনারবীয় শাসনব্যবস্থার যুগ ১২৫
শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবির রাজনৈতিক আন্দোলন ১৩১
আধ্যাত্মিক উন্নতির পেছনে অর্থনীতির প্রভাব ১৪১
সভ্যতা ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ১৪৮

সভ্যতার বুনিয়াদি চরিত্র

এই পৃথিবীতে মানবসভ্যতার বসবাসের কত সহস্র বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং সভ্যতার বিবর্তনের এ পর্যায়ে আসতে কত মনজিল ও গন্তব্য তাকে অতিক্রম করতে হয়েছে; এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় মানবসমাজ অনেক সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিনির্মাণ করেছে, বড় বড় ফালসাফা ও দর্শনের ভিত্তি রেখেছে, অসংখ্য ও অগণিত জ্ঞানের বিকাশ ঘটেছে। আখলাক, নৈতিকতা এবং শিষ্টাচারের নতুন নতুন মানদণ্ড নির্ধারণ হয়েছে। আম্বিয়ায়ে কেরামকে পাঠানো হয়েছে এবং তাদের কাছে তাদেরই ভাষায় আল্লাহ তাআলার বাণী পৌঁছানো হয়েছে। দার্শনিক ও জ্ঞানীরা নতুন নতুন তত্ত্ব ও মতবাদ নিয়ে চিন্তা করেছেন। মোটকথা, এখন পর্যন্ত এত সভ্যতা-সংস্কৃতি, তাহজিব-তামাদ্দুন, আখলাক ও ধর্মীয় চিন্তধারার আবির্ভাব হয়েছে যে, তা গণনা করা প্রায় অসম্ভব। প্রত্যেক যুগ একটা নতুন চিন্তা ও দর্শন নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে এবং প্রত্যেক জাতিই এই দাবি করেছে যে, যেই তাহজিব-তামাদ্দুন তারা নিয়ে এসেছে, অতীতে না এ ধরনের কৃষ্টি কারও ছিল, আর না ভবিষ্যতে কারও কাছে আসবে। لا و انا غيري ‘আমি ছাড়া আর কেউ নয়’-এর আওয়াজ প্রত্যেক জাতির সূচনালগ্নেই শোনা যায়।

যাহোক, এটা অস্বীকারের উপায় নেই যে, প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্রতা নিজ নিজ অবস্থানে মুসলমান এবং প্রত্যেক চিন্তা ও দর্শনই নিজ নিজ সময়ে নিজের জন্য ভিন্ন একটা পরিবেশ তৈরি করেছিল। কিন্তু মানুষ যেভাবে স্থান, কাল, পাত্র, সাময়িক ও বাহ্যিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও প্রকৃতার্থে এক (চাই সে দশ হাজার বছর আগের অসভ্য মানুষ হোক অথবা আজকের যুগে মধ্য আফ্রিকায় বসবাস করা হাবশি কিংবা বর্তমান যুগের উন্নত ইউরোপিয়ান; যেমনিভাবে একটা পর্যায়ে তাদের সবার মধ্যে মানবতার মৌলিক কিছু বিষয় এক ও অভিন্ন এবং যদিও লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তন তাদেরকে ‘কিছু’ থেকে ‘ভিন্নকিছু’ বানিয়েছে; কিন্তু যখন প্রকৃত মানবতার প্রশ্ন আসে, তখন তাদের মধ্যে একটা বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় এবং মৌলিকভাবেও তাতে কোনো পার্থক্য সামনে আসে না), ঠিক একইভাবে বিভিন্ন নৈতিক তত্ত্ব, তাহজিব ও তামাদ্দুনিক দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা-দর্শন ও ধর্মসমূহের মধ্যে একমাত্রায় ঐক্য বিদ্যমান। যদিও বিবর্তন তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দিয়েছে এবং তাদেরকে ‘কোথা’ থেকে অন্য ‘কোথাও’ নিয়ে গেছে; কিন্তু এতকিছুর

পরও এসব তত্ত্বকথার মাঝে কিছু মৌলিক বিষয় এমন, যাতে সবার মধ্যে মিল পাওয়া যায়। দৃষ্টবাদীদের কাছে এ বিষয়টি সব সময় গোপন থাকে এবং কুয়োর ব্যাঙের মতো নিজস্ব চিন্তা-ভাবনাকেই সবার চেয়ে ভিন্ন ও একমাত্র মনে করে এবং নিজেদের মস্তিষ্ককে অন্যদের থেকে একেবারে আলাদা ও পৃথক করে নেয়। ফলাফল দাঁড়ায়, পানি যেভাবে প্রবাহমান নদী অথবা সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে পড়ে, তেমনিভাবে চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির দরজা বন্ধ করে আলাদা থাকা সম্প্রদায়ের চিন্তাশক্তিও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

যেমনিভাবে মহাবিশ্বের (Univers) বহুত্ব মানুষের মস্তিষ্ককে অস্থির করে তোলে এবং মহাবিশ্বে নিজের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করতে বাধ্য করে, যাতে সে এই বহুত্বের মাঝে একত্বকে খুঁজে পায়; ঠিক তেমনিভবে অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী জ্ঞানী লোকেরা মানুষের মধ্যকার এই বাহ্যিক বহুত্বের মাঝে—যাকে আমরা সংস্কৃতি, কালচার কিংবা চিন্তা বলে থাকি—অভিন্ন ও মৌলিক বাস্তবতা অনুসন্ধানের চেষ্টা করে; যাতে করে সে মানবসভ্যতার মৌলিক বাস্তবতা সামনে রেখে নিজ তাহজিব ও তামাদ্দুনের ভিত্তি সেই অভিন্ন ও মৌলিক নীতির ওপর স্থাপন করতে পারে—যা সকল মানুষের মাঝে সমান; যাতে করে জাতির চিন্তা ও দার্শনিক চিন্তা-কাঠামো জীবনের প্রকৃত উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন না হয় এবং সে যেন সমস্ত মানবতা এবং তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রামের ভালোটা নিজের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ধারণ করতে পারে।

ইসলাম তার প্রাথমিক যুগে মানব ইতিহাসের এই খেদমত খুব ভালোভাবে আনজাম দিয়েছে। কুরআনের অধ্যয়ন থেকে জানা যায়, কীভাবে সে যুগে বিভিন্ন জাতি ও সভ্যতা একে অপরের বিরুদ্ধে তেড়ে আসত এবং প্রতিটি জাতি নিজেকে অন্যদের থেকে আলাদা, অমুখাপেক্ষী, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধীন মনে করত। খ্রিষ্টানরা বলত, যারা খ্রিষ্টান না, তারা প্রকৃতপক্ষে মানুষই না। এভাবে ইহুদিরাও নিজেদেরকে সবার থেকে আলাদা করে নিয়েছিল। ইরানিরা নিজেদের জায়গায় মত্ত ছিল আর অন্যদিকে হিন্দুস্তানের অধীবাসীরা সমুদ্রের দিকে তাকানোকেও নিজেদের ধর্মবিরুদ্ধ কাজ বলে মনে করত। সে সময় পৃথিবীর অবস্থা এমন ছিল, যেন ছোট ছোট গর্তগুলোতে পানি আসা বন্ধ হয়ে গেছে এবং প্রতিটি গর্ত অন্যটি থেকে ছিল বিচ্ছিন্ন, আর সেই গর্তে থাকা পানিগুলো ধীরে ধীরে পচে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে পড়ছিল। হঠাৎই আরবে এক নতুন সম্প্রদায় বন্যার মতো আবির্ভূত হয়ে সবাইকে এক করে দিলো এবং সমগ্র মানবসভ্যতা আলাদা থাকার পরিবর্তে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটা গভীর সমুদ্রে পরিণত হলো। সকল জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা এখানে এসে একত্র হতে থাকল এবং মানবসভ্যতা সম্মিলিতভাবে এগিয়ে যাওয়ার একটা সুযোগ পেয়ে গেল। আরবরা ছিল অশিক্ষিত, তারা সকল জাতির জ্ঞানকে আহরণ করতে লাগল। কেননা, তাদের ধরা-বান্ধা কোনো

সভ্যতার উত্থান–পতনের রহস্য

আমার দৃষ্টিতে সংস্কৃতি মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রয়োজন, এর সুতোগুলো মানুষের ভেতর থেকে উৎপন্ন হয়। একটি সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য মানুষের কোনো বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয় না। যদি একজন পুরুষ ও মহিলাকে নির্জন কোনো দ্বীপে ফেলে রাখা হয়, তাহলে তারা তাদের নিজস্ব প্রকৃতির মাধ্যমেই একটি সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারবে।

এই সংস্কৃতি ততক্ষণ পর্যন্তই ভালো থাকে, যতক্ষণ তা মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজন পূরণ করতে পারে; কিন্তু যখন কোনো একটা জাতির মাঝে বিশেষ একটা অংশ সাংস্কৃতিক দিক থেকে অনেক এগিয়ে যায় এবং অন্যরা—যারা সংখ্যায় অনেক বেশি—পিছিয়ে পড়ে, তখন সেই সংস্কৃতির মধ্যে ঘুণ ধরে যায়। আর তখন প্রকৃতি অথবা সময়ের দাবি এটাই থাকে যে, সেই অপ্রচলিত সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিতে হবে। জাতির একটা সীমিত অংশের এই দ্রুত অপ্রাকৃতিক বিকাশের অনিবার্য ফল হলো লক্ষ-কোটি মানুষ সামান্য আর্থিক প্রয়োজন পূরণ করতে হিমশিম খায়, আর অন্যদিকে অল্পকিছু মানুষের কাছে অঢেল সম্পদ এসে জমা হতে থাকে। এ অবস্থায় জাতি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। ব্যক্তির যোগ্যতা অকেজো হয়ে পড়ে, বিলাসিতা সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ে, জাতির সামগ্রিক স্বার্থ উপেক্ষিত হয়ে পড়ে। সবাই নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার চিন্তা করতে থাকে, প্রত্যেক ব্যক্তি তখন এই চিন্তা করতে থাকে যে, আগে নিজের উদরপূর্তি করি, নিজের চাহিদা ও খাহেশাত পূরণ করি, চাই প্রতিবেশী না খেয়ে মারা যাক! একটা জাতি যখন বিবর্তনের এই চক্রে আটকা পড়ে যায়, তখন সে জাতির মধ্যে বিপ্লব অনিবার্য হয়ে পড়ে।

যদি জাতির সকল অংশ এই রোগ দ্বারা পক্ষাঘাতগ্রস্ত না হয়ে পড়ে এবং জাতির সাধারণ জীবনে জীবনের তপ্ত খুন তখনও প্রবাহমান থাকে, সেই পতনোন্মুখ অংশের জায়গা নিতে জাতির অন্য আরেকটা অংশ দাঁড়িয়ে যায়। তারা সেই অংশকে জোরপূর্বক অথবা সংশোধন করে সামর্থ্যানুযায়ী তাদেরকে রাজনীতি থেকে পৃথক করে দেয় এবং জাতির লাগাম নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়। এই অংশ তখন নিজেদের নতুন তাহজিব-তামাদ্দুন ও সভ্যতা-সংস্কৃতি তৈরি করে; আর পুরাতন সেই সংস্কৃতি ছেঁড়া জামার মতো অকেজো হয়ে পড়ে; কিন্তু যদি পতনের সেই জীবাণু জাতির সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সামসময়িক গুরুত্ব

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন 'রেশমি রুমাল' আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে শায়খুল হিন্দ রহ.-এর আদেশে মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধি রহ. ১৯১৫ সালে ভারত থেকে কাবুল গমন করেন। মাওলানা সিন্ধি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য অনেক ত্যাগ ও সংগ্রাম করেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন যে শাস্তি তিনি ভোগ করেছেন তা হলো ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের জেরে বিশ বছরের নির্বাসন জীবন। এ সময় তিনি অনেক কষ্টের মধ্যে জীবন পার করেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য তিনি অগণিত রাষ্ট্র সফর করেন। ইস্তাম্বুল থেকে সুইজারল্যান্ড হয়ে মক্কা মুকাররমায় পৌঁছান। এখানে তিনি বারো বছর পর্যন্ত হারাম শরিফে থাকেন এবং কাবা শরিফের নুরানি তাজাল্লি থেকে বরকত লাভ করেন। এ সময় তিনি ভারতবর্ষের মুসলমানদের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ এবং পুনর্গঠনের জন্য যা কিছু ভেবেছেন তা নিয়ে ১৯৩৯ সালে হিন্দুস্তানে আগমন করেন এবং দেশবাসীকে দ্বীনের মৌলিক শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপের আহ্বান করেন। মাওলানা সিন্ধি ১৯৩৯ সালে করাচি বন্দরে নামার পর যে বয়ান পেশ করেন তা নিম্নরূপ—

নিছক মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা অথবা বংশীয় মহব্বত আমাকে এ বয়সে হিন্দুস্তানে টেনে নিয়ে আসেনি। আমি এখন বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি, জানি না জীবনের আর কতদিন বাকি আছে! যদি আমি শান্তি ও সুকুন চাইতাম, তাহলে এই বৃদ্ধ বয়সে হারামে পাকের পবিত্র ভূমিতে জীবনের শেষ দিনগুলি পার করতে এবং সেখানেই নিজেকে শেষ করতে পছন্দ করতাম। আমি এই বৃদ্ধ বয়সে অত্যন্ত দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও আপনাদের কাছে এজন্য এসেছি যে, আপনাদের কাছে আমার কিছু বলার আছে।

আপনাদের মুরব্বি (শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রহ. এবং তাঁর জামাত) আমাকে বাইরে পাঠিয়েছিলেন। বাইরে থেকে আমার পক্ষে যা কিছু ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য করা সম্ভব ছিল তা করেছি। এই লম্বা সময়ে আমি অনেক কিছু দেখেছি এবং অনেক আশ্চর্যজনক অবস্থার মধ্য দিয়ে আমাকে অতিক্রম করতে হয়েছে। আমি আপনাদের যা কিছু বলতে চাচ্ছি, তা মন দিয়ে শুনুন! আমি আমার জীবনের চব্বিশ বছর হিন্দুস্তানের বাইরে পার করেছি। এই দীর্ঘ সময়ে আমি শুধু দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিনি অথবা নিছক দর্শক হিসেবে প্রত্যক্ষ করিনি, বরং আমি নিজেও বড় বড় অভিযানে অংশ

তাসাওউফ

তাসাওউফের প্রবণতা মানব মস্তিষ্কের একটি বিশেষ গুণ। কিছু মানুষ অভ্যেসগতভাবে ফিতরাতগত কারণে এর অনেকাংশ পেয়ে থাকে, কিছু মানুষ পায় কম; আবার কিছু মানুষ এটা পাওয়ার জন্য উপযুক্ত ও অনুকূল পরিবেশ লাভ করে। আর কিছু মানুষ এ থেকে মাহরুম থেকে যায়। মোটকথা, এই জজবা মানুষের মধ্যে কোনো-না-কোনো মাত্রায় থাকা আব্যশক। কিন্তু এই তাসাওউফের জজবা আসলে কী এবং মানুষের জীবনকে এটা কীভাবে প্রভাবিত করে?

কথা হচ্ছে, মানুষ শুধু হাড্ডি-মাংসের নাম নয়, সেই হাড্ডি এবং মাংসের মধ্যে একটি অংশ আছে, যা কথা বলে, চিন্তা করে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে পদক্ষেপ নেয়। এটা মানুষের 'খুদি' বা 'আমিত্ব'। এটা কোনো কিছু চিন্তা করে, বলে এবং এরপর তার জন্য সংগ্রাম শুরু করে। তাসাওউফ এই আমিত্বের মধ্যে একপ্রকার উত্তেজনা সৃষ্টি করে, তাতে একটি তরঙ্গ তৈরি করে, তার মাঝে এক আন্দোলন সৃষ্টি করে; যাতে সে চিন্তা করে এবং কোনো কিছু আকাঙ্ক্ষা করে এবং এর জন্য কাজে মনোযোগী হয়। এটি একটি বৈদ্যুতিক প্রবাহের মতো, যা মানুষের ভেতর দিয়ে সঞ্চালিত হয়। ধর্ম এবং শরিয়ত, নামাজ-রোজা ও পূজাপাঠ—এগুলোর নাম তাসাওউফ নয়। তাসাওউফের জজবা এই আমলগুলোকে ইখলাস ও খাঁটি বিশ্বাসের সাথে মন থেকে করার জন্য উৎসাহ দেয়। তাসাওউফ জীবনের বিশেষ কোনো কর্মপন্থা বলে দেয় না, বরং এটি কর্মের পথে সাহস ও অধ্যবসায়ের সাথে পরিচালিত করার একটি চেতনা।

সাধারণত সকল মানুষই এক, সবার মধ্যেই কুদরত কোনো-না-কোনো বিশেষত্ব দিয়ে রেখেছে। মতপার্থক্য হয় শুধু সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর ব্যবহার করা এবং না করার ক্ষেত্রে। তাসাওউফ সেই বৈশিষ্ট্যগুলোকে বিকশিত, পরিমার্জিত এবং এর দ্বারা কল্যাণকর কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এক অর্থে তাসাওউফ সবার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ, ধর্মীয় কোনো আইনে এর আলাদা বিশেষায়ণ নেই। এর অর্থ এই নয় যে, শরিয়তের কোনো প্রয়োজন নেই, বরং তাসাওউফ সেই চেতনাকে গ্রহণ করার পরামর্শ দেয়। তাসাওউফ ঈমানের ওপর জোর দেয় এবং নেক আমলের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে। সুফি শরিয়তের নির্দেশিত পথের ওপর চলে; কিন্তু একটি তরঙ্গের ওপর। নিজের আবেগ ও উদ্দীপনা থেকে সেই সুর ও তরঙ্গ, সেই আবেগ ও উদ্দীপনা তৈরি করাই তাসাওউফের কাজ।

সভ্যতা

মানুষ দুনিয়ার জীবন বিভিন্ন রকম দুঃখ-দুর্দশা ও কষ্টের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করে। আর বুদ্ধিজীবী শ্রেণির মানুষ এ সমস্ত অনেক সমস্যার সমাধানও বের করে ফেলেছে। আর কিছু সমস্যার সমাধানের চেষ্টা এখনো চলমান। যে পদ্ধিতে অর্থনৈতিক ও আর্থিক সমস্যা সহজেই কাটিয়ে ওঠা যায়, তাকে পরিভাষায় ارتفاقات। 'ইরতিফাকাত' অথবা مرافق 'মুরাফিক' বলা হয়। ارتفاقات 'ইরতফিাক' শব্দের মূল ধাতু হচ্ছে رفق; এর অর্থ হচ্ছে 'কোমলতা' বা 'সদয় আচরণ' করা। এটা এভাবে বোঝার চেষ্টা করুন, মহাবিশ্বের যা কিছু মানুষের জন্য উপকারী, তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানুষের ব্যবহারযোগ্য হয়ে আসে না, বরং এগুলো কাঁচামালের মতো, যাকে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হয়। এ সমস্ত জিনিস মানুষকে তার সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী প্রস্তুত করে নিতে হয়। এ সহজতা, সুযোগ-সুবিধা ও লাভকেই পরিভাষায় ارتفاق। 'ইরতিফাক' বলা হয়। ইরতিফাকের (মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির) চারটি ধাপ রয়েছে—

সভ্যতার প্রথম পর্যায়

এ পর্যায়ে গোটা মানবসভ্যতার কিছু মৌলিক জিনিস সমানভাবে প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ, খাদ্য, বস্ত্র ও থাকার জায়গা। এই মৌলিক জিনিসের পূর্ণতা মানুষের স্বভাবগত প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। অথবা এভাবে বলা যায়, মানুষের স্বভাব অনুযায়ী এ জিনিসগুলির জ্ঞান তার মধ্যে প্রাকৃতিকভাবেই থাকবে। এজন্য তারা চাষাবাদের জন্য কোনো-না-কোনো পন্থা অবলম্বন করবে, পানির জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও উপায় অবলম্বন করবে এবং পেট ভরার জন্য বিভিন্ন কাঁচা-পাকা খাবারের ব্যবস্থা করবে। সামনে গিয়ে তারা পশু ও জানোয়ারকে নিজেদের বশ্যতার মধ্যে নিয়ে আসবে এবং তাদের চামড়া দিয়ে নিজেদের পোশাক তৈরি করবে। হিংস্র পশুদের থেকে নিজেদের সুরক্ষার জন্য ঘর তৈরি করবে। নিজের শারীরিক প্রয়োজন পূরণের জন্য এবং নিজের বংশীয় ধারাবাহিকতা গতিশীল রাখার জন্য একজন স্ত্রীকে বিবাহ করে নিজের সাথে রাখবে এবং এই আশা রাখবে, যাতে অন্য কেউ তার ব্যক্তিগত জীবনে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ না করে।

ইসলামি ইতিহাসের সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ ও কুরআনের বৈশ্বিক বিপ্লব

দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের আহলে ইলমগণ দীর্ঘ একটা সময় ধরে ইতিহাসকে ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন; এ রোগ আমাদের এখানকার জালেম বাদশাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। জোরজবরদস্তির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো জামাতের পরিবর্তে ব্যক্তির ওপর বেশি গুরুত্বারোপ করা হয় এবং ইতিহাসের উত্থান-পতন, ঘটনা, নতুনত্ব, বিবর্তন ও পরিবর্তন সামষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার পরিবর্তে নির্দিষ্ট গুটি কয়েক ব্যক্তির চরিত্রের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এজন্য আমাদের ইতিহাসের গ্রন্থসমূহ জাতির সামগ্রিক জীবনের বিবর্তন ও পতনের কারণসমূহের ওপর বিশ্লেষণ না করে রাজা-বাদশাহ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এ ধারাই আমাদের জ্ঞানীদের ইসলামের সামষ্টিক শক্তি উপেক্ষা করে তাদের সমস্ত শক্তি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করতে বাধ্য করে।

ইসলামি ইতহাসের বস্তুনিষ্ঠ অধ্যয়ন

এজন্য বিভিন্ন জাতির জীবনে তাদের উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে সমাজ বা জামাতবদ্ধ জীবনের যে ভূমিকা, আমাদের আহলে ইলমরা সে বিষয়ে আলোচনা করা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না। উদাহরণস্বরূপ, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাত যখন লিখতে বসেন, তখন মক্কার সামগ্রিক জীবন, কুরাইশের জাতীয় ব্যবস্থাপনা ও কাঠামো, কুসাইর যুগ থেকে কুরাইশের সংগঠন ও বিস্তৃতি, যা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন ও তাঁর মিশনের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত—তারা এই ব্যাপারগুলোর দিকে ভ্রুক্ষেপ করেন না। তারা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত ও রেসালাতের ক্ষেত্রে শুধু এ বিষয়টির দিকে দৃষ্টিপাত করেন যে, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছিল সমগ্র মানবজাতির জন্য একজন পূর্ণাঙ্গ উন্নত মানব সৃষ্টি করবেন।

প্রত্যেক আলেমের কাছে সিরাতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বিষয়টিই থাকে, যা তারা নিজেদের ইলমি যোগ্যতা ও চিন্তার প্রবণতা অনুযায়ী উপস্থাপন

শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবির রাজনৈতিক আন্দোলন

ঈসায়ি আঠারো শতকের শুরু অর্থাৎ ১৮০৩ সালে মুফাক্কিরে ইসলাম মুজাদ্দিদে মিল্লাত শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. দিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৬৩ সালে মাত্র একষট্টি বছর বয়সে এই দুনিয়া থেকে রুখসত গ্রহণ করেন।

ইংরেজরা যেখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সম্মিলিত শক্তি নিয়ে ১৬০৮ সালে ভারতবর্ষে ব্যবসার উদ্দেশ্যে আগমন করেছিল, নিজেদের বন্ধুত্বপূর্ণ ষড়যন্ত্রের আড়ালে ১৬৬৩ সালের মধ্যে তারা এত শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, তারা এখন সব ধরনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে থাকে। এমনকি আলমগিরের শাসনামলের শেষ পর্যন্ত তারা কোনো ধরনের রাজনৈতিক কাজে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পায়নি। যদিও তারা পর্দার আড়ালে বিদ্রোহী শক্তিগুলোকে উস্কানি দিতে থাকত। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, মারাঠারা যখন শিবাজির নেতৃত্বে সুরাটে[৫১] হামলা করে, সেখানকার বাসিন্দা এবং ব্যবসায়ীদের লুটতরাজ করে, তখন তারা ইংরেজ ব্যবসায়ীদের কোঠা সুরক্ষিত রেখে দেয়। দেখে মনে হচ্ছিল, যেন ইংরেজদের উস্কানিতেই পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী মারাঠারা গোপন অভিযান চালিয়েছিল। এর মাধ্যমে শুরুর দিন থেকেই ইংরেজদের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য প্রকাশ পেয়ে যায়, তারা আসলে কী চায় এবং তারা কীভাবে হিন্দুস্তানের শাসক হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। তখনকার দিনে উলামাদের একটি দল দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ইসলামি ন্যায়বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত করার এবং এর মাধ্যমে সকল দুর্নীতি দূরীকরণে সচেষ্ট ছিলেন। এখান থেকে আলেমদের পরিপক্ক দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের কাজের গুরুত্ব অনুমান করা যায়।

আলমগিরের মৃত্যুর সাথে সাথে হিন্দুস্তানে মুঘলদের রাজনৈতিক শক্তির পতন শুরু হয়ে যায় এবং সমগ্র দেশ ত্বরিতগতিতে বিশৃঙ্খলায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এ সময় নাদির শাহ দিল্লিতে লুটপাট চালায়, মধ্য হিন্দুস্তান এবং মহারাষ্ট্রে মারাঠারা তাদের আধিপত্য বিস্তার করে, বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর নিজেদের স্বাধীন শাসক ঘোষণা করে। দক্ষিণ

৫১. গুজরাটের একটি শহরের নাম।

হিন্দুস্তানে শিখদের সেনাবাহিনী মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে আর ইংরেজরা প্রকাশ্যে হিন্দুস্তানের এই রাজনৈতিক অবস্থায় হস্তক্ষেপ শুরু করে।

শাহ ওলিউল্লাহর বিপ্লবী আন্দোলন

মুসলমানদের শক্তির এই সর্বজনীন নীরবতা ছিল খুবই উদ্বেগজনক; তাতে সবচেয়ে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করেন শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ.। যেমনটা আগে বলা হয়েছে। শাহ সাহেব রহ. ১৭৬৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন; যেখানে ১৮৭৯ সালে ফরাসি বিপ্লব সংগঠিত হয়—যাকে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার প্রতিক মনে করা হয়। একইভাবে কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মাক্স ৫৫ বছর পর ১৮১৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন, যাকে অর্থনীতি ও সমাজ বিপ্লবের জনক মনে করা হয়। কিন্তু এটা কি লক্ষ করার মতো বিষয় নয় যে, ফরাসি বিপ্লবের প্রায় ৫০ বছর আগে এবং কমিউনিস্ট বিপ্লবের প্রায় দেড়শ বছর আগেই শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. আগামী যুগে ইসলামের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজ ও সভ্যতার সর্বজনীন মূলনীতি সুবিন্যস্ত করে লিখে গিয়েছেন, যা জাতির জটিল সমস্যার সর্বোত্তম সমাধান এবং মানবতার মুক্তির সবচেয়ে বড় নিশ্চয়তা।

আফসোসের ব্যাপার হলো, প্রচারযন্ত্র ও প্রোপাগান্ডার যে মাধ্যম মাক্সের অনুসারী এবং ফরাসি বিপ্লবীরা পেয়েছে, তা শাহ সাহেবের চিন্তা ও দর্শনের প্রচারের সময় পাওয়া যায়নি, অন্যথায় আজ পৃথিবীর ইতিহাস অন্যরকম হতে পারত। যাহোক, এই ভূখণ্ডে যখন ইংরেজদের পদচারণা বাড়তে থাকে এবং তারা শক্তিশালী হতে থাকে, শাহ সাহেবের প্রতিষ্ঠিত জামাতের সংগ্রাম ও সাধনাও বাড়তে থাকে। শাহ সাহেব রহ. পরিস্থিতিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের আধ্যাত্মিক অবস্থার পর্যালোচনা করে ইসলামি চিন্তা ও অনুশীলনের একটি পূর্ণাঙ্গ ম্যানুয়াল উপস্থাপন করেন; এর পাশাপাশি একটি জামাতও গঠন করেন।

ওলিউল্লাহি আন্দোলনের প্রথম সদস্যবৃন্দ

ওই সময় সে জামাতের বিশেষ সদস্যবৃন্দ ছিল নিম্নোল্লিখিত উলামায়ে কেরাম, যাদের প্রভাব ভারতবর্ষের দূরদূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

১. মাওলানা মুহাম্মাদ আমিন ওলিউল্লাহি কাশ্মিরি; তিনি শাহ সাহেবের জীবন উৎসর্গকারী সাথি ছিলেন। শাহ সাহেব রহ.-এর পর তিনিই তাঁর জামাতের মুরব্বি নিযুক্ত হন।

আধ্যাত্মিক উন্নতির পেছনে অর্থনীতির প্রভাব

উপমহাদেশের হিন্দুরা নিজেদের এই বৈশিষ্টের জন্য সর্বদা গর্বিত যে, তাদের সংস্কৃতি এবং রাজনীতি কখনো ধর্ম ও ধার্মিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি। ভারতবর্ষের উচ্চপদস্থ বংশধর হজরত শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. এই বৈশিষ্ট্যেরই প্রতিফলন।[৫৬] এই মহান আলেম আধ্যাত্মিকতা ও চারিত্রিক দর্শনের ব্যাপারে অভিজ্ঞ, এমনকি তাঁর পরিচিতজনরা তাকে এই বিশেষত্বের জন্য তাকে 'শাহ' উপাধী দান করে, যা ভক্তি ও শ্রদ্ধা থেকে আধ্যাত্মিক মুরব্বিদের দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এই মহান নেতার দৃষ্টিভঙ্গি হলো, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজে যে ধ্বংস ও দুর্দশা দেখা দেয় তার প্রধান কারণ হলো— *অর্থনৈতিক সংকট,* যা ভারতবর্ষকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

এই ধর্মীয় নেতার এই দার্শনিক অবস্থান শুধু ভারতবর্ষের বিশেষ অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত না, বরং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি হলো, মানবসভ্যতার ইতিহাসে সর্বদা এটাই হয়ে আসছে যে, অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতার কারণে সর্বদা ধর্মীয় দুর্গগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। এজন্য অর্থনৈতিক সংস্কারই ধর্মীয়, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কারের প্রথম সিঁড়ি। শেষ পর্যন্ত শাহ সাহেব রহ. সমাজের অর্থনৈতিক সংস্কারকে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বলে অবহিত করেছেন। সুতরাং তিনি হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায় আয়ের উৎস শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনায় বলেন,

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেরণের সময় দুনিয়ার অবস্থা ছিল, বিলাসবহুল জীবন-যাপন আর মাত্রাতিরিক্ত বাদশাহি আচরণের (যা দেশ ও জাতিকে অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা ধ্বংসের) দিকে ঠেলে দিয়েছিল। এই ব্যাধি ইরান, রোম ও অন্যান্য স্থানে মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। তখন আল্লাহ তাআলা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে এ বিষয়টি স্থাপন করলেন, তিনি যেন এই রোগের এমনভাবে চিকিৎসা করেন। রোগটা শুধু যে নিরাময় হবে তা-ই নয়, বরং এর বিষাক্ত অতীতও যেন ধ্বংস হয়ে যায়—যে কারণে এই রোগ জন্মলাভ করেছে। সুতরাং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সমস্ত বিষয় ও কারণগুলোর ওপর গভীরভাবে দৃষ্টি

৫৬. শাহ সাহেব রহ. হজরত উমর রাদি.-এর বংশধর। তার জীবনীগ্রন্থগুলোতে এর বিস্তারতি সনদ উপস্থিত রয়েছে।

সভ্যতা ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি

শাহ ওলিউল্লাহর দর্শনের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখে যদি তাঁর আকাশচুম্বী রচনা হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা পাঠ করা হয়, তাহলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শাহ সাহেব রহ.-এর নিকট আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের শিক্ষা যেমনিভাবে মানুষের অভ্যন্তরীণ অনুষদের ইসলাহ ও সংস্কারের পর তদেরকে আল্লাহ তাআলার দিদার লাভের যোগ্য করে তোলে, তেমনিভাবে সভ্যতার বাহ্যিক (মানুষের বাহ্যিক অঙ্গভঙ্গি, আখলাক ও নৈতিকতা) ইসলাহ ও সংস্কারের আবশ্যকীয়তাও পালন করেন। শাহ সাহেব রহ.-এর মত অনুযায়ী নবুওয়াতের উদ্দেশ্য হলো, মানুষের সামগ্রীক জীবনের ইসলাহ ও সংস্কার এবং সভ্যতা, আর নবুওয়াত حسنة في الدنيا। তথা দুনিয়াবি কল্যাণ حسنة في الآخر। এবং আখেরাতের কল্যাণ উভয়ের ওপর কর্তৃত্ব করে এবং উভয়ের তত্ত্বাবধান করে।

নবুওয়াতের এই পরিচয় যদি পরিষ্কার হয়ে যায়, তাহলে ইবনে খালদুন নবুওয়াতের সাথে সম্পৃক্ত যে দর্শন উপস্থাপন করেছে, তা স্পষ্টভাবে ভুল প্রমাণিত হয়। ইবনে খালদুনের মতে, মানবসভ্যতার জন্য নবুওয়াতের প্রয়োজন নিছক এই জীবনের পর আখেরাতের যে জীবন রয়েছে, সে বিষয়ে জানার জন্য। যতদূর মানুষের দুনিয়াবি অর্থনীতির প্রশ্ন আসে, মানুষ তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য নবুওয়াতের মুখাপেক্ষী না।

নবুওয়াতের ব্যাপারে ইবনে খালদুনের এই বক্তব্য আবরদের চিন্তা-চেতনায় অনেক বৈরি প্রভাব ফেলে। আরবরা ইবনে খালদুন ছাড়া আর কোনো আলেম খুঁজে পায় না,[৬৩] আর ইবনে খালদুনের অবস্থা হলো—তিনি নবুওয়াতকে শুধু পরকালের রহস্য উন্মোচনের জন্য নিবেদিত মনে করেন এবং তিনি মনে করেন, দুনিয়াবি উন্নতির জন্য আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের প্রয়োজন নেই। ইবনে খালদুনের এই চিন্তা মানুষকে পার্থিব বিষয়ে নবিদের শিক্ষার অমুখাপেক্ষী করে তোলে এবং এটাও স্পষ্ট যে, এর ফলাফল ব্যক্তি ও সভ্যতার জন্য কখনোই কল্যাণকর হবে না। ফলে নবুওয়াতকে শুধু আখেরাতের চিকিৎসা মনে করার কারণে আজ আরবরা পার্থিব বিষয়ের সমাধানের জন্য খুব সহজেই ইউরোপীয় শাসকদের ধ্যান-ধারণা ও প্রোপাগান্ডার শিকার হয়। কিন্তু শাহ সাহেব রহ. নবুওয়াতের

৬৩. খুব সম্ভব খালদুনের সমকক্ষ আর কাউকে বুঝিয়েছেন; কিন্তু খালদুনের সমকক্ষ না পাওয়া ব্যাপরাটা নিয়ে সংশয় আছে।—অ.

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

বঙ্গবিজেতা বখতিয়ার – মুহাম্মাদ সাদ সাকী
হিন্দুস্তান : ব্রিটিশ আগ্রাসনের আগে ও পরে – হুসাইন আহমদ মাদানি
ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের অবদান – সাইয়েদ সালমান মানসুরপুরি
১৮৫৭ সিপাহি বিপ্লবের ইতিবৃত্ত – মুহাম্মাদ হাসিবুল হাসান
ঈশা খাঁ – মহিম জোবায়ের
খিলজি শাসন – হুসাইন আহমাদ খান
বুদ্ধিবৃত্তির নববি বিন্যাস – যুবায়ের বিন আখতারুজ্জামান
শাহ ওলিউল্লাহ দেহলবি : ওসিয়ত ও নসিহত
ইসলামি রাষ্ট্রচিন্তার পুনর্গঠন – মাওলানা ওবাইদুল্লাহ সিন্ধি
কলবুন সাকিম – মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ
ভাষাজ্ঞান – হাবীবুল্লাহ সিরাজ

প্রকাশিতব্য কিছু বই

ফকির আন্দোলন – এহসানুল্লাহ জাহাঙ্গীর
সিরাজুদ্দৌলা – আমিরুল ইসলাম ফুআদ
ঔপনিবেশিক ভারত – ইমরান রাইহান
ঔপনিবেশিক ভারত : ব্রিটিশ শাসন
দ্য ইন্ডিয়ান মুসলমানস – ড. এইচ হান্টার
বাঙালি মুসলমানের পরিচয় – খন্দকার ফজলে রব্বি
ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবদান – সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবি
খাজা নিজামুল আউলিয়া – সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবি
তিতুমীর – মুহাম্মাদ মুর্শিদুল আলম
তুঘলকি সাম্রাজ্যের ইতিহাস – আমিন আশরাফ